بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৭ নভেম্বর, ২০২০ মোতাবেক ২৭ নবুয়্যত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ হযরত আলী বিন আবি তালিবের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে খুলাফায়ে রাশেদীনদের স্মৃতিচারণ আরম্ভ করব। হযরত আলী বিন আবি তালিব বিন আব্দিল মুত্তালিব বিন হাশেম; তার পিতার নাম ছিল আবদে মানাফ, যার ডাকনাম ছিল আবু তালিব। তার মাতার নাম ছিল ফাতেমা বিনতে আসাদ বিন হাশেম। তিনি মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতের দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা.)-এর শারীরিক গঠন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে– তিনি মাঝারি গড়নের ছিলেন, চোখ কালো ছিল; তার শরীর মোটাসোটা ও কাঁধ চওড়া ছিল। হযরত আলীর মা তার নাম নিজের পিতার নামের সাথে মিলিয়ে আসাদ রেখেছিলেন, আর তার জন্মের সময় আবু তালিব বাড়িতে ছিলেন না। যখন আবু তালিব ফিরে আসেন, তখন তিনি তার নাম আসাদের পরিবর্তে আলী রাখেন। হযরত আলীর তিনজন ভাই ও দু'জন বোন ছিলেন। তার ভাইয়েরা হলেন তালিব, আকীল ও জা'ফর এবং বোনেরা হলেন উম্মে হানি ও উম্মে জামানা। এদের মধ্যে তালিব ও জামানা ছাড়া বাকি সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আলীর ডাকনাম ছিল আবুল হাসান, আবু সাবতাইন ও আবু তুরাব।

সহীহ বুখারীর বর্ণনানুসারে হযরত সুহায়ল বিন সা'দ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত ফাতেমার ঘরে গিয়ে হযরত আলীকে ঘরে পান নি। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার চাচাতো ভাই কোথায়?' হযরত ফাতেমা বলেন, 'তার ও আমার মধ্যে কিছু বাকবিতণ্ডা হয়েছিল, এতে তিনি আমার ওপর রাগ করে চলে যান আর আমার ঘরে কায়লুলা (দুপুরের বিশ্রাম)-ও করেন নি।' তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন একজনকে বলেন, 'দেখ তো সে কোথায়!' সেই ব্যক্তি আসে ও বলে, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি মসজিদে ঘুমিয়ে আছেন।' রসূলুল্লাহ্ (সা.) তখন মসজিদে যান এবং হযরত আলী সেখানে শুয়ে ছিলেন, তার শরীর থেকে তার চাদর সরে গিয়েছিল এবং পার্শ্বদেশে বা কোমরে কিছুটা মাটি লেগে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) মাটি মুছে দেন এবং বলেন, 'হে আবু তুরাব, (মাটির বাবা) ওঠো! হে আবু তুরাব, ওঠো!' তখন থেকে তিনি এই আবু তুরাব ডাকনামে পরিচিত হন। তিনি যেভাবে মহানবী (সা.)-এর অভিভাবকত্বে এসেছিলেন সেই বিষয়ে বর্ণিত আছে।

মুজাহিদ বিন জাবার আবুল হাজ্জাজ বর্ণনা করেন, "আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কুরায়শদের উপর এক বড় দুর্যোগ নেমে আসা হযরত আলীর জন্য আশির্বাদ আর মঙ্গল ও কল্যাণের কারণ হয়। হযরত আবু তালিবের পরিবার অনেক বড় ছিল। এজন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের চাচা আব্বাসকে, যিনি বনু হাশেমের মধ্যে সবচেয়ে স্বচ্ছল ব্যাক্তি ছিলেন– গিয়ে বলেন, 'হে আব্বাস! আপনার ভাই আবু তালিবের পরিবার অনেক বড়; এই দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষজন কী অবস্থায় আছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন! [সেখানে দুর্ভিক্ষ চলছিল– হুযূর (আই.)]। আপনি আমার সাথে চলুন যেন আমরা গিয়ে তার পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার কিছুটা লাঘব করতে পারি। তার পুত্রদের মধ্য থেকে একজনের দায়িত্ব আমি নিই, আর [হযরত আব্বাসকে বলেন,] একজনের দায়িত্ব আপনি নিন।' তিনি (সা.) বলেন, 'আমরা তাদের দু'জনের জন্য আবু তালিবের দায়িত্ব পালন করব।' হযরত আব্বাস বলেন, 'ঠিক

আছে।' তারা দু'জন হযরত আবু তালিবের কাছে আসেন এবং বলেন, 'আমরা আপনার পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার কিছুটা লাঘব করতে চাই, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের বর্তমান দুরাবস্থা দূর হয়।' হযরত আবু তালিব বলেন, 'আকীলকে আমার কাছে থাকতে দাও; তাকে বাদ দিয়ে তোমরা যা চাও করতে পার।' অতএব রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আলীর হাত ধরে তাকে নিজের বুকে টেনে নেন এবং হযরত আব্বাস জা'ফরকে নিজের কাছে টেনে নেন।

হযরত আব্বাস জাফর (রা.)কে নিয়ে গেলেন এবং নিজের সাথে রাখলেন। আল্লাহ তা'লা কর্তৃক মহানবী (সা.)-কে নবী হিসাবে প্রেরণ করা পর্যন্ত হযরত আলী (রা.) তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন। এর হযরত আলী তাকে অনুসরণ করেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনেন এবং তাঁর (সা.) সত্যায়ন করেন; আর হযরত জাফর হযরত আব্বাস (রা.)-এর সাথে থাকেন, আর তিনি অর্থাৎ হযরত জাফর (রা.)ও ইসলাম গ্রহণ করেন, ফলে হযরত আব্বাস (রা.) হযরত হযরত জাফরের বিষয়ে দায়মুক্ত হয়ে যান।" এর রেওয়ায়েতটি নেয়া হয়েছে তাবারীর ইতিহাস গ্রন্থ থেকে। এই ঘটনাটিই হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন-

"আবু তালেব খুবই সম্মানিত একজন মানুষ ছিলেন কিন্তু দরিদ্র ছিলেন; আর অনেক কষ্টে তার জীবন নির্বাহ হতো। বিশেষতঃ সেই দিনগুলোতে; যখন মক্কায় এক দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছিল, তখন তার দিন খুবই কষ্টে চলতো। মহানবী (সা.) যখন তাঁর চাচার এই অবস্থা দেখেন, তখন তিনি তার অন্য চাচা আব্বাস (রা.)কে একদিন বলেন যে, 'চাচা, আপনার ভাই আবু তালেবের জীবনযাত্রা কষ্টে চলছে। যদি তার ছেলেদের মধ্য থেকে একজনকে আপনি আপনার ঘরে নিয়ে যান, আর একজনকে আমি নিয়ে আসি- তবে তা কতইনা ভালো হয়! আব্বাস (রা.) এই প্রস্তাবে একমত হলেন। এরপর দু'জনে মিলে আবু তালেবের কাছে গিয়ে তাকে এ প্রস্তাব দিলেন। তিনি তার সন্তানদের মধ্যে আকীলকে খুবই ভালোবাসতেন। তিনি বলেন, ' আকীলকে আমার কাছে রেখে দাও বাকীদেরকে যদি চাও নিয়ে যাও।' অতএব জাফরকে আব্বাস (রা.) নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন আর আলীকে (রা.) মহানবী (সা.) নিজের কাছে নিয়ে যান। হযরত আলী (রা.)-এর বয়স তখন আনুমানিক ছয় সাত বছর ছিল। এরপর থেকে হযরত আলী (রা.) সবসময় মহানবী (সা.) এর কাছে থাকেন।

হযরত আলী (রা.)-এর ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, "হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইসলামগ্রহণ এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে নামায পড়ার একদিন পর হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.) আসেন।" বর্ণনাকারী বলেন, "তিনি (রা.) মহানবী (সা.) এবং হযরত খাদিজা (রা.)-কে নামায পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করেন, 'হে মুহাম্মদ (সা.)! এটি কি?' জবাবে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'এটি আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত ধর্ম এবং এটিসহ রসূলদের প্রেরণ করেছেন। অতএব আমি তোমাকে আল্লাহ্ এবং তাঁর ইবাদতের প্রতি আর লাত ও উযযাকে প্রত্যাখানের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।" একথা শুনে হযরত আলী (রা.) মহানবী (সা.)-কে বলেন, "আজকের পূর্বে এমন কথা আমি কখনো শুনি নি। আবু তালিবের সাথে আলোচনার পূর্বে আমি এ বিষয়ে কোন কথা বলতে পারব না।" রসূলুল্লাহ্ (সা.) চান নি যে তাঁর নবুয়্যতের ঘোষণা প্রদানের পূর্বে বিষয়টির গোপনীয়তা প্রকাশ হোক। তাই মহানবী (সা.) বলেন, "হে আলী! তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ না কর, ঠিক আছে; তবে বিষয়টি গোপন রাখবে।" অতঃপর হযরত আলী (রা.) সেই রাত কাটান এবং আল্লাহ্ তা'লা হযরত আলী (রা.)-র হৃদয়ে ইসলামকে প্রবিষ্ট করেন। পরদিন সকালে তিনি (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হন এবং নিবেদন করেন, 'হে মুহাম্মদ (সা.)! গতরাতে আপনি আমাকে কিসের কথা বলছিলেন?' রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, "তুমি সর্বান্তকরণে সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, অদ্বিতীয় এবং তাঁর কোন অংশীদার নেই। লাত এবং উযযাকে অস্বীকার কর এবং আল্লাহ্ তা'লার শরীকদের থেকে দায়মুক্তির ঘোষণা দাও।"

অতএব হযরত আলী (রা.) এমনটি-ই করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু তালিবের ভয়ে হযরত আলী (রা.) চুপিসারে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসতেন এবং নিজের মুসলমান হওয়ার কথাটি গোপন রাখেন; অথচ সেখানেই থাকতেন, কেননা বিভিন্ন বর্ণনায় এটিই দেখা যায়। এটি মূলতঃ উসুদুল গাবার বর্ণনা। হযরত খাদিজার পর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন হযরত আলী (রা.)। তখন তার বয়স ছিল তের বছর। অন্য কিছু রেওয়ায়েতে পনের, ষোল এবং আঠার বছরেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরুষদের মধ্যে প্রথমে কে ঈমান এনেছিলেন, হযরত আবু বকর, হযরত আলী, নাকি হযরত যায়েদ- জীবনীলেখকগণ এ বিতর্কেও লিপ্ত হয়েছেন। অনেকের চূড়ান্ত গবেষণা মোতাবেক বালকদের মধ্যে হযরত আলী এবং বড়দের মধ্যে হযরত আবু বকর এবং দাসদের মধ্যে হযরত যায়েদ। এ বিষয়ে হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেবও নিজের একটি অভিমত উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, "হযরত খাদিজার পরে পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ-কেউ হযরত আবু বকর আব্দুল্লাহ্ বিন আবি কুহাফার নাম উল্লেখ করেন; কেউ-কেউ হযরত আলীর কথা বলেন, যার বয়স তখন কেবল দশ বছর ছিল আর কেউবা মহানবী (স.) এর মুক্তকৃত দাস হযরত যায়েদ বিন হারেসার নাম উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এসব বিতর্ক বৃথা। হযরত আলী এবং যায়েদ বিন হারেসা মহানবী (স.) এর ঘরের লোক ছিলেন এবং তাঁর সন্তানদের ন্যায় তাঁর সাথে থাকতেন। মহানবী (স.) এর বলা আর তাদের ঈমান আনা (স্বাভাবিক বিষয়); সত্য কথা হলো তাদের পক্ষ থেকে হয়তো কোন মৌখিক স্বীকারোক্তিরও প্রয়োজন ছিল না। অতএব তাদের নাম মাঝে আনার কোন প্রয়োজনই নেই।" অর্থাৎ মহানবী (স.) এর বলা এবং তাদের ঈমান আনা স্বাভাবিক বিষয়। তাদের পক্ষ থেকে মৌখিক কোন স্বীকারোক্তির প্রয়োজনই নেই। তাই এর মধ্যে তাদের নাম আনার দরকারই নেই। "বাকীদের মধ্যে সর্বস্বীকৃতভাবেই হযরত আবু বকর সর্বাগ্রে রয়েছেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম ঈমানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।"

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (র.) বলেন: "হযরত মুসা (আ.) আল্লাহ্ তা'লার কাছে যাচনা করে একজন সাহায্যকারী পেয়েছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদ (স.) এর মহিমা দেখুন; তিনি না চাইতেই একজন সাহায্যকারী পেয়েছেন।" এখানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত খাদিজার (রা.) উল্লেখ করতে চাচ্ছেন এবং বলছেন, হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর (সা.) সাহায্যকারী ছিলেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তা'লার মহিমা দেখো যে তিনি (সা.) না চাইতেই একজন সাহায্যকারী পেয়ে গেছেন। অর্থাৎ তাঁর সেই স্ত্রী- যার প্রতি তাঁর সীমাহীন ভালবাসা ছিল, সর্বপ্রথম তিনিই তাঁর (স.) প্রতি ঈমান আনেন। যেহেতু প্রতিটি ব্যক্তি ধর্ম ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বাধীন আর কেউ কাউকে বলপূর্বক মানাতে পারে না, এজন্য যখন তিনি (সা.) হযরত খাদিজার কাছে খোদা তা'লার প্রথম ওহী সম্পর্কে বলেন, তখন মহানবীকে সঙ্গ না দিয়ে "আমি বুঝে শুনে কোন সিদ্ধান্ত নিব" বলা তার জন্য অসম্ভব ছিল না।' কিন্তু না; হযরত খাদিজা কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই কালবিলম্ব না করে আর আগপিছ না ভেবেই তাঁর দাবীর সমর্থন করেন এবং মহানবী (স.) এর এ দুঃচিন্তা দূর হয়ে যায় যে, 'হয়তো খাদিজা আমার প্রতি ঈমান না-ও আনতে পারে'– এবং সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী হযরত খাদিজাই। খোদা তা'লা যেন তখন আরশের ওপর বসে বলছিলেন 'আ লাইসাআল্লাহু বিকাফিন আবদাহ' অর্থাৎ 'হে মুহাম্মদ! খাদিজার প্রতি তোমার প্রেম ভালবাসা ছিল, আর তোমার অন্তরে এ ধারণা ছিল যে, খাদিজা না আবার আমাকে ত্যাগ করে বসে এবং তুমি এ চিন্তায় ছিলে যে, 'খাদিজা কি আমার প্রতি ঈমান আনবে নাকি আনবে না?' কিন্তু আমরা তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করেছি, না কি করি নি?" হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "এরপর যখন তার ঘরে খোদার ওহী সম্পর্কে কথা হল তখন তাঁর ঘরে লালিত দাস যায়েদ বিন হারেস, এগিয়ে আসে এবং বলে, 'হে আল্লাহ্র রসূল

(স.)! আমি আপনার প্রতি ঈমান আনছি।' এরপর হযরত আলী, যার বয়স তখন এগার বছর ছিল এবং যিনি তখনও নিতান্ত একজন বালক ছিলেন, আর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মহানবী (স.) এবং হযরত খাদিজার কথোপকথন শুনছিলেন; তিনি যখন এসব শুনলেন যে, খোদার বাণী এসেছে, তখন সেই আলী যিনি একজন কুশলী ও চৌকশ বালক ছিলেন; সেই আলী যার ভেতর পুণ্য ছিল, সেই আলী যার পুণ্যের উচ্ছাস ছিল কিন্তু বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। সেই আলী যার চিন্তাচেতনা ছিল অতি উচ্চমার্গের কিন্তু তখনো বুকের মাঝেই চাপা ছিল আর সেই আলী যার মাঝে আল্লাহ তা'লার গ্রহণীয়তার বৈশিষ্ট অন্তর্নিহিত রেখেছিলেন কিন্তু তখনো তিনি কোন সুযোগই পান নি! তিনি যখন দেখলেন, এখন আমার আবেগ অনুভূতি উদ্ভাসিত হওয়ার সময় এসে গেছে, তিনি যখন দেখেন, এখন আমার আবেগ অনুভূতি বিকশিত হবার সুযোগ এসে গেছে, তিনি যখন দেখেন, এখন খোদা আমাকে নিজের দিকে আহ্বান করছেন, তখন সেই নাবালক আলী একবুক বেদনা নিয়ে কাচুমাচু হয়ে একান্ত লজ্জাবনত শিরে এগিয়ে আসেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার চাচী যার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন, যে বিষয়ে যায়েদ ঈমান আনয়ন করেছে তাতে আমিও ঈমান আনছি।

তবরীর ইতিহাসে লেখা আছে, নামাযের সময় হলে মহানবী (সা.) মক্কার উপত্যকায় চলে যেতেন আর হযরত আলীও চাচা আবু তালেব এবং অন্যান্য চাচা ও গোত্রের সব লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে চলে যেতেন। উভয়েই সেখানে নামায আদায় করে সন্ধ্যায় ফিরে আসতেন। এমনি ধারা চলছিল, অবশেষে একদিন আবু তালেব তাদের দু'জনকে নামায আদায় করতে দেখে ফেলে এবং মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করে, হে আমার ভাতিজা! তোমাদেরকে আমি এ কোন ধর্মের অনুসরণ করতে দেখছি। তিনি (সা.) উত্তরে বলেন, হে আমার চাচা! এটি আল্লাহর ধর্ম, তাঁর ফেরেশতাকুলের ধর্ম, তাঁর রসূলদের ধর্ম আর আমাদের পিতৃপুরুষ হযরত ইব্রাহীমের ধর্ম বা এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন কথা বলেন। সেই সাথে তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা'লার এর সাথে আমাকে মানুষের প্রতি প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। আর হে চাচা! আপনি এ বিষয়ের অগ্রাধিকার রাখেন যে, আমি আপনাকে নসীহত করি আর আপনাকে হেদায়েতের পানে আহ্বান জানাই এবং আমাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বা সাহায্য করার ক্ষেত্রে আপনিই সর্বাধিক উপযুক্ত ও যোগ্য বা এমন কোন কথা বলে থাকবেন। একথা শুনে আবু তালেব বলেন, হে আমার ভাতিজা! আমি আমার ও আমার পিতৃপুরুষের ধর্ম যাতে তারা প্রতিষ্ঠিত ছিল তা পরিত্যাগ করার ক্ষমতা রাখি না কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি যতদিন জীবিত আছি কোন অপ্রীতিকর বিষয় তোমার কাছেও ভিড়তে পারবে না। হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব উক্ত ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

একবার মহানবী (সা.) ও হযরত আলী (রা.) মক্কার কোন একটি উপত্যকায় নামায আদায় করছিলেন। হঠাৎ আবু তালেব সেদিক দিয়ে যায়। তখনো আবু তালেব ইসলাম সম্পর্কে অনবহিত ছিল। এজন্য, সে খুবই অবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখতে থাকে। তিনি (সা.) যখন নামায সমাপ্ত করেন তখন সে জিজ্ঞেস করে, হে ভাতিজা! এটা কোন ধর্ম যা তোমরা অবলম্বন করেছ? মহানবী (সা.) বললেন, চাচা! এটি ঐশী ধর্ম এবং ইব্রাহীমের ধর্ম। তিনি (সা.) সংক্ষেপে আবু তালেবকে ইসলামের তবলীগ করেন কিন্তু আবু তালেব একথা বলে এড়িয়ে যায় যে, আমি আমার পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারবো না কিন্তু একই সাথে তার পুত্র হযরত আলী (রা.)-কে সম্বোধন করে বলে, হে আমার পুত্র! তুমি নির্দ্বিধায় হযরত মহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গ দিয়ে যাও কেননা আমি বিশ্বাস রাখি, সে তোমাকে পুণ্য ছাড়া অন্য কোন দিকে আহ্বান করবে না।

আল্লাহ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর নিজ আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করার ঘটনার উল্লেখ এক যায়গায় এভাবে পাওয়া যায়, হযরত বারা বিন আযেব বর্ণনা করেন,

মহানবী (সা.)-এর প্রতি যখন 'ওয়া আনযির আশীরাতাকাল আকরাবীন' আয়াত অবতীর্ণ হলো অর্থাৎ তুমি তোমার পরিবার পরিজন তথা আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক কর; তখন তিনি (সা.) বলেন, হে আলী! আমাদের জন্য এক সা' আহার্যের সাথে ছাগলের রান রান্না করো। অপর এক রেওয়ায়েতে সা' এর স্থলে মুদ্ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এক সা' চার মুদ্দ ছিল অর্থাৎ আড়াই শেরের কিছু কম বা আড়াই কিলোও বলা যায়। এখানে এটিও বর্ণিত হয়েছে কুফা এবং ইরাকবাসীর সা' ছিল আট মুদ্দে'র অর্থাৎ চার শের অথবা সাড়ে চার শেরের মত কিন্তু তা আড়াইশের হোক বা চার শের, যাই হোক হোক না কেন তা পরিমাণে ছিল খুবই সামান্য। নিজ বংশের লোকদেরকে দেওয়াত দেয়ার ছিল আর এ উদ্দেশ্যে খাবার তৈরীর কথা ছিল। তিনি বলেন, আমাদের জন্য বড় এক পেয়ালা দুধের ব্যবস্থা করো আর বনু আব্দুল মুত্তালেবকে একত্রিত করো। হযরত আলী বলেন, আমি এমনটাই করলাম, সবাই একত্রিত হয়। তারা প্রায় এক কম বা বেশি চল্লিশজন হবে। এদের মাঝে তাঁর চাচা আবু তালেব, হামজা, আব্বাস এবং আবু লাহাবও ছিল। আমি তাদের সামনে খাবারের সেই বড় পাত্রটি পরিবেশন করি, তখন মহানবী (সা.) সেই পাত্র থেকে মাংসের একটি টুকরা নেন আর নিজের দাঁত দিয়ে সেটি ছিঁড়ে বরকতের জন্য পাত্রের চতুর্দিকে তা ছড়িয়ে দেন আর বললেন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খাও। লোকেরা সবাই পেটভরে খায়। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাদের সবার সামনে যে খাবার পরিবেশন করেছিলাম তা কেবল একজন ব্যক্তির পেটভরার মত ছিল। অতঃপর তিনি (সা.) বললেন, লোকদের পান করাও, অতএব আমি দুধের সেই পেয়ালা নিয়ে আসি আর সবাই এথেকে তৃপ্তির সাথে পান করে। আল্লাহ্‌র কসম, এর পুরোটা কেবল এক ব্যক্তিই পান করতে পারতো। অতঃপর মহানবী (সা.) যখন উপস্থিত লোকদের সাথে কথা বলতে চাইলেন তখন আবু লাহাব চট করে বলল যে, দেখ তোমাদের সাথি তোমাদের ওপর কেমন জাদু করেছে। এরপর তারা সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় বা সেখান থেকে চলে যায় আর মহানবী (সা.) তাদের সাথে কথা বলতে পারেন নি। পরের দিন তিনি (সা.) বলেন, হে আলী! গতকাল যে খাবার এবং পানীয় তুমি প্রস্তুত করেছিলে ঠিক তেমনিই আবার প্রস্তুত কর; আমি তা-ই করি। আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করি আর মহানবী (সা.)ও ঠিক তা-ই করলেন যা তিনি গতদিন করেছিলেন অর্থাৎ খাবারে বরকত দান করেছিলেন।

এরপর তারা সকলে তৃপ্তির সাথে খায় ও পান করে। এরপর রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন হে বনু আব্দুল মুত্তালেব! আমি আরবের কোন যুবককে জানি না যে তার জাতির জন্য আমি যা নিয়ে এসেছি এর চেয়ে উত্তম কিছু নিয়ে আসতে পারে। আমি তোমাদের জন্য ইহ ও পরকালের কল্যাণকর বিষয়াদি নিয়ে এসেছি। এরপর তিনি (সা.) বলেন, এতে কে আমাকে সাহায্য করবে? হযরত আলী (রা.) বলেন, সবাই নীরব থাকে এবং আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহর রসূল! আমি যদিও সর্বকনিষ্ঠ কিন্তু আমি আপনার সাহায্যকারী হবো। সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে এ বিষয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব লেখেন, মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, একটি নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা কর এবং এতে বনুআব্দুল মুত্তালেবকে ডাকো যেন এভাবে তাদের মাঝে সত্যের বানী পৌঁছানো যায়। হযরত আলী (রা.) নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন। মহানবী (সা.) তাঁর সকল নিকট আত্মীয়কে যাদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশজন ছিল এই নিমন্ত্রণে ডাকেন। তাদের আহার শেষে মহানবী (সা.) কিছু বলতে চাইলে দুর্ভাগা আবু লাহাব এমন কথা বলে বসে যার কারণে সকলেই সেখান থেকে উঠে চলে যায়। এরপর মহানবী (সা.) তখন হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, এই সুযোগ হাত ছাড়া হচ্ছে তাদেরকে আবার নিমন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করো। অতএব তাঁর (সা.) আত্মীয় স্বজন আবারও একত্র হয়। তিনি (সা.) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন যে, হে বনু আব্দুল মুত্তালেব! আমি তোমাদের নিকট এমন বিষয় নিয়ে এসেছি যে, এর চেয়ে উত্তম কোন বিষয়

কোন ব্যক্তি তার জাতির কাজে নিয়ে আসে নি। আমি তোমাদেরকে খোদার পানে আহ্বান করছি, তোমরা আমার কথা গ্রহণ করলে ইহ ও পরকালের সর্বত্তোম কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী হবে। এখন বল, এ কাজে কে আমার সাহায্যকারী হবে। সবাই নীরব ছিল আর সভার সর্বত্র নীরবতা ছেয়ে ছিল। হঠাৎ করে একদিক থেকে তের বছর বয়সী এক হ্যাংলা পাতলা বাচ্চা যার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল, উঠে দাঁড়ালো এবং বললো যে, যদিও আমি সবচেয়ে দুর্বল এবং সর্বকনিষ্ঠ তবুও আমি আপনার সঙ্গ দিব। এটি ছিল হযরত আলী (রা.)-এর কথা। মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-এর এই কথা শুনে নিজ আত্মীয়স্বজনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা যদি বুঝে থাকো তাহলে এই বালকের কথা শোন এবং তার কথা মেনে নাও। উপস্থিত সকলে এ দৃশ্য দেখে শিক্ষাগ্রহণ করার পরিবর্তে খিলখিল করে হেসে ওঠে এবং আবু লাহাব নিজ বড় ভাই আবু তালেবকে উদ্দেশ্য করে বলে, নাও! এখন মুহাম্মদ তোমাকে তোমার ছেলের অনুসরণ করার আদেশ প্রদান করছে। অতঃপর এই লোকেরা ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর অসাহয়ত্ব নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে করতে সেখান থেকে বিদায় নেয়।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই ঘটনার উল্লেখ এভাবে করেন, বিশেষ করে শিশুকিশোরদের এটি মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত কেননা হযরত আলী (রা.) মাত্র ১১ বছর বয়সে ধর্মের সমর্থনে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল হয় তখন তিনি (সা.) একটি দাওয়াতের আয়োজন করেন যেখানে মক্কার বড় বড় সম্পদশালীদের ডাকেন এবং তাদেরকে খাবার খাওয়ান। তারপর তিনি (সা.) বলেন, আমি আমার দাবী সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। এটি শুনে সবাই পলায়ন করে। এ দৃশ্য দেখে হযরত আলী (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকটে আসলেন এবং বললেন, হে আমার ভ্রাতা! আপনি এটি কী করলেন? এরা জগতপূজারী মানুষ। এদেরকে প্রথমে তবলীগ এবং পরে খাওয়ানো উচিত ছিল। এই বেঈমানেরা তো খাবার খেয়েই পালিয়ে গেছে কেননা এরা তো খাবারের লোভী। আপনি যদি প্রথমে কথা বলতেন, দুই ঘণ্টা তবলীগ করলেও তারা বশে শুনতো, এরপর তাদের খাবার খাওয়াতেন। মহানবী (সা.) এটি করেন অর্থাৎ তাদেরকে আবার দাওয়াত দেন কিন্তু এবার প্রথমে কিছু কথা শুনিয়ে তারপর খাবার খাওয়ান। তিনি (সা.) দাঁড়িয়ে বলেন, হে লোকসকল! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কথা শুনিয়েছি। তোমাদের মাঝে কি কেউ আছে যে আমায় সাহায্য করবে এবং এ কাজে আমার সাহায্য করবে? মক্কার সকল বড় বড় লোক বসে থাকে কেবল হযরত আলী (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, হে আমার চাচাতো ভাই! আমি আপনাকে সাহায্য করবো। মহানবী (সা.) ভাবলেন, সে তো নিতান্ত এক বালক, তাই তিনি (সা.) আবার দাঁড়িয়ে বলেন, হে লোকসকল! তোমাদের মাঝে কি কেউ আছে যে আমাকে সাহায্য করবে? এবারও সকল বয়োবৃদ্ধরা বসে রইল এবং সেই ১১ বছরের বালক দাঁড়িয়ে যায় আর বলে, হে আমার চাচাতো ভাই! আমি আছি তো। আমি আপনাকে সাহায্য করবো। মহানবী (সা.) তখন বুঝে গেলেন, খোদার দৃষ্টিতে এই ১১ বছরের বালকই যুবক আর এই বয়োবৃদ্ধরা সকলেই শিশু। তাদের মাঝে কোন শক্তি নেই। এই বালকই বুদ্ধিমান তাই তিনি (সা.) তাকে নিজের সঙ্গী করে নিলেন। আর সেই হযরত আলীই শেষ পর্যন্ত মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন এবং তাঁর (সা.) পরে খলীফাও হন। তিনি (রা.) ধর্মের ভিত্তি দৃঢ় করেন এবং একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রজন্মকেও পুণ্যবান করে গড়ে তুলেন, যার ফলে ১২ প্রজন্ম পর্যন্ত লাগাতার তাঁদের মাঝে ১২ জন ইমাম জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একস্থানে হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন,

হযরত আলী (রা.) যখন ঈমান আনেন তখন তিনি বালকই ছিলেন। তিনিও এ বিশ্বাস নিয়েই ঈমান এনেছিলেন যে, ইসলামের খাতিরে আমাকে সকল প্রকার বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হবে। বালক ছিলেন কিন্তু এই জ্ঞান ছিল যে, আমাকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে;

এমনকি খোদা তা'লার রাস্তায় প্রাণ বিসর্জন দেবার প্রয়োজন হলে তা-ও দিতে হবে। হাদীসে রয়েছে, মহানবী (সা.) তাঁর নবুয়্যত লাভের প্রারম্ভিক দিনগুলোতে বনূ আব্দুল মুত্তালিবকে সত্যর বাণী পৌঁছানোর জন্য একটি দাওয়াতের ব্যবস্থা করেন। মহানবী (সা.)-এর অনেক আত্মীয়স্বজন এই দাওয়াত খেতে আসে। সবার খাওয়া শেষ হলে মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে চাইলেন কিন্তু আবু লাহাব তাদের সবাইকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং লোকেরা তাঁর (সা.) কথা না শুনেই নিজ নিজ গৃহে ফিরে যায়। এটি দেখে মহানবী (সা.) অবাক হন যে, এরা অদ্ভুত মানুষ! দাওয়াত খেয়েও কথা শোনে না। যাহোক, মহানবী (সা.) এর পরও আশা ছাড়েন নি বরং তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, পুনরায় তাদেরকে ডাকা হোক। অতএব পুনরায় সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়। তাদের পেটভরে খাওয়ার পর মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে বলেন, দেখুন! এটি আপনাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার কত বড় অনুগ্রহ! তিনি তাঁর নবীকে আপনাদের মাঝে প্রেরণ করেছেন। আমি আপনাদেরকে খোদার দিকে আহ্বান করছি। আপনারা যদি আমার কথা মেনে নেন তাহলে আপনারা পারলৌকিক ও ইহজাগতিক কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী হবে। আপনাদের মাঝে এমন কেউ কি আছেন যিনি আমাকে এ কাজে সাহায্য করবেন? একথা শোনার পর গোটা বৈঠকে নিস্তব্ধতা ছেয়ে যায় কিন্তু তৎক্ষণাৎ কামরার এক কোণ থেকে (তাদের মাঝে) সবচেয়ে দুর্বলএক বালক উঠে দাঁড়ায় আর সে বলে, যদিও আমি একজন অত্যন্ত দুর্বল মানুষ এবং বয়সের দিক থেকেও সবার চেয়ে ছোট তথাপি আমি আপনার সঙ্গ দিবো। এই বালকটি ছিলেন হযতর আলী (রা.) যিনি তখন ইসলামের সমর্থনের ঘোষণা দেন।

মহানবী (সা.)-এর হিজরতের সময় হযরত আলী (রা.) যে ত্যাগস্বীকার করেছেন সে ঘটনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, মক্কাবাসী পরস্পর পরামর্শ করে মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে হানা দিয়ে যখন তাঁকে বন্দী বা হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটে তখন ওহীর মাধ্যমে তিনি (সা.) শত্রুদের এই দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অবগত হন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করার পর তিনি (সা.) হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং হযরত আলী (রা.) কে সেই রাতে মহানবী (সা.)-এর বিছানায় ঘুমানোর নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর লাল রং-এর সেই হাযরামী চাদরাবৃত হয়ে রাত অতিবাহিত করেন, যেটি গায়ে চড়িয়ে তিনি (সা.) ঘুমাতেন। মুশরেকদের যেই দল রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য ওঁত পেতে বসেছিল তারা প্রভাতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর গৃহে প্রবেশ করলে হযরত আলী (রা.) ঘুম থেকে উঠেন। কাছে আসার পর তারা হযরত আলী (রা.)কে চিনতে পারে এবং তাকে জিজ্ঞেস করে যে, তোমার সাথি কোথায়? অর্থাৎ মহানবী (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তখন হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি জানি না; আমি কি তার পাহারাদার? তোমরা তাঁকে মক্কা ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলে, তাই তিনি চলে গেছেন। মুশরেকরা তাকে বকাঝকা ও মারপিট করে এবং ধরে কাবা গৃহে নিয়ে যায় আর সেখানে কিছুক্ষণ আটকে রেখে ছেড়ে দেয়।

এরপর আরেকটি সীরাত গ্রন্থে লেখা আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে মক্কাবাসীর আমানত ফিরিয়ে দিয়ে ৩ দিন পর হযরত আলী (রা.) হিজরত করে নবী করীম (সা.)-এর নিকট পৌঁছেন এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে ক্বাবায় উম্মে কুলসুম বিন হিদমের বাড়ি অবস্থান গ্রহণ করেন। হিজরতের সময় যে ঘটনা ঘটেছে সীরাতে খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে সেটির উল্লেখ এভাবে হয়েছে যে,অন্ধকার রাত ছিল আর বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত যালেম কুরাইশর তাদের জিঘাংসা নিয়ে মহানবী (সা.)-এর বাড়ির চার পাশে অবস্থান নিয়ে বাড়ি ঘিরে রেখেছিল। তারা প্রভাত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল যে, মহানবী (সা.)- নিজ গৃহ থেকে বের হলেই তারা অতর্কিতে আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করবে। মহানবী (সা.)-এর নিকট অনেক কাফেরের আমানত গচ্ছিত ছিল। প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর সততা

ও বিশ্বস্ততার কারণে অধিকাংশ লোক তাদের আমানত তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখত। কাজেই মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.) কে এসব আমানতের হিসাবনিকাশ বুঝিয়ে দেন এবং জোরালো নির্দেশ প্রদান করে বলেন, আমানত ফেরত না দিয়ে মক্কা থেকে বের হবে না। এরপর মহানবী (সা.) তাকে বলেন, তুমি আমার বিছানায় শুয়ে পড় আর তাকে আশ্বস্ত করেন যে, আল্লাহর কৃপায় তার কোন ক্ষতি হবে না। তিনি শুয়ে পড়েন আর মহানবী (সা.) তাঁর লাল চাদরটি তার ওপর দিয়ে দেন। এরপর তিনি (সা.) আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে পড়েন। তখন অবরোধকারীরা তাঁর দরজার সামনেই উপস্থিত ছিল কিন্তু যেহেতু ধারণাই ছিল না যে, মহানবী (সা.) রাতের প্রথম প্রহরেই এভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বেন। তারা তখন এতটা উদাসীনতার ঘোরে আচ্ছন্ন ছিল যে, মহানবী (সা.) তাদের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের সামনে দিয়ে চলে যান কিন্তু তারা ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি। মহানবী (সা.) নীরবে কিন্তু দ্রুত মক্কার অলি গলি অতিক্রম করছিলেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জনবসতি থেকে বাহিরে বেরিয়ে আসেন এবং সওর গুহার পথে অগ্রসর হতে থাকেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে পূর্বেই সববিষয় নির্ধারিত ছিল। পথিমধ্যে তিনি (রা.)ও তাঁর সাথে যোগ দেন। এই ঘটনার কারণেই সওর গুহা ইসলামের একটি পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হয়। মক্কার দক্ষিণে অর্থাৎ মদিনার বিপরীত দিকে ৩ মাইল দুরত্বে অবস্থিত এক বিরান ও জনমানবহীন পাহাড়ের অনেক উঁচু একটি স্থানে অবস্থিত এক গুহা। এতে পৌঁছার পথও অত্যন্ত দুষ্কর। (এটি মদীনার দিকে নয় বরং এর উল্টো দিকে অবস্থিত।) সেখানে পৌঁছার পর প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.) গুহার ভিতরে প্রবেশ করে জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন আর এরপর মহানবী (সা.)ও ভিতরে প্রবেশ করেন। অপরদিকে যেসব কুরাইশ মহানবী (সা.)-এর গৃহ অবরুদ্ধ করে রেখেছিল তারা একটু পর পরই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঘরের ভেতর উঁকি মেরে দেখতো আর হযরত আলী (রা.) কে তাঁর যায়গায় শায়িত দেখে তারা আশ্বস্ত হতো। কিন্তু সকালে তারা বুঝতে পারে তাদের শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে তখন তারা এদিক সেদিক ছুটতে থাকে। মক্কার অলিগলিতে সাহাবীদের বাড়িঘরে তারা তল্লাশি চালায় কিন্তু তাঁর (সা.) কোন সন্ধান পায় না। এই ক্ষোভে তারা হযরত আলী (রা.) কে ধরে নিয়ে গিয়ে সামান্য মারধর করে।

হযরত আলী (রা.)-এর এই ত্যাগের উল্লেখ হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এভাবে করেছেন যে, মহানবী (সা.) ঘর থেকে বের হওয়ার সময় হযরত আলী (রা.) কে নিজের বিছানায় শুইয়ে দেন। তখন খাটের বা চারপায়ীর প্রচলন ছিল না, বরং এখনও মক্কাতে খাট ব্যবহারের প্রচলন নেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে ভুলে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) তাকে নিজ খাটে শুইয়ে দেন। (তখন বিছানা বানানো হতো কিন্তু চৌকি বা খাট ছিল না) তাদের কেউ কেউ তাঁকে (সা.) দেখে ছিল কিন্তু তারা মনে করে, এই ব্যক্তি অন্য কেউ হবে, সম্ভবত তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসে থাকবে আর এখন ফিরে যাচ্ছে। এর মূল কারণ হলো, মহানবী (সা.) অত্যন্ত বীরত্বের সাথে বাইরে বের হয়েছিলেন এবং তাঁর মাঝে বিন্দুমাত্র ভীতিও ছিল না। তারা মনে করেছিল, তিনি (সা.) এত সাহসিকতার সাথে বাইরে বের হওয়ার সাহস কীভাবে করতে পারেন! নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি অন্য কেউ হবে যে তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাতের জন্য এসে থাকবে। এরপর তারা এটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে উঁকি দেয় যে, তিনি বের হয়ে চলে যান নি তো আবার? তারা এক ব্যক্তিকে শুয়ে থাকতে দেখে এবং মনে করে, ইনিই মহানবী (সা.)। মোটকথা, সারা রাত ধরে তারা তাঁর (সা.) বাড়ি পাহারা দিতে থাকে। এরপর সময় সঠিক মনে করে তারা ভিতরে প্রবেশ করে। সম্ভবত দেহ দেখে তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, এ দেহ মহানবী (সা.)-এর নয়। তারা মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে দেখে অথবা মুখ খোলা ছিল হয়তো, যাহোক তারা বুঝতে

পারে যে, শায়িত ব্যক্তি হযরত আলী (রা.) রসূলে করীম (সা.) নন। তখন তারা বুঝতে পারে, মহানবী (সা.) নিরাপদে চলে গেছেন এবং তাদের জন্য এখন ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

অন্য এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা হযরত আলী (রা.) কে এই মহান ত্যাগস্বীকারের সৌভাগ্য দান করেছেন। অর্থাৎ, মহানবী (সা.) যখন হিজরতের উদ্দেশ্যে রাতের বেলা নিজ গৃহ থেকে বের হতে চাইলেন তখন তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.) কে বললেন, তুমি আমার বিছানায় শুয়ে পড় যেন কাফেররা উঁকি দিলে কোন ব্যক্তি বিছানায় শুয়ে রয়েছে বলে চোখে পড়ে আর তারা যেন পিছু ধাওয়ার জন্য এদিক সেদিক বেরিয়ে না পড়ে। সেসময় হযরত আলী (রা.) এ কথা বলেন নি যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! বাড়ির চতুর্দিকে কুরায়েশদের বাছাই করা যুবকরা হাতে তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা যদি সকালে জানতে পারে, আপনি বেরিয়ে গেছেন তখন তারা আমার ওপর আক্রমণ করে আমাকে হত্যা করবে। বরং হযরত আলী (রা.) প্রাশান্ত চিত্তে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিছানায় শুয়ে পড়েন এবং মহানবী (সা.) নিজের চাদর তার ওপর দিয়ে দেন। প্রভাতে কুরায়েশরা যখন দেখতে পায় হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবর্তে হযরত আলী (রা.) তাঁর বিছানা থেকে উঠেছেন তখন তারা নিজেদের ব্যর্থতায় দাঁত কামড়াতে থাকে এবং হযরত আলীকে (রা.) তারা মারধর করে। কিন্তু এতে কী যায় আসে। নিয়তির লেখা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিরাপদে মক্কা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তখন হযরত আলী (রা.)-এর জানা ছিল না যে, এই ঈমানের পরিবর্তে তিনি কী লাভ করবেন! তবে আল্লাহ্ তা'লা জানতেন, এ কুরবানীর বিনিময়ে শুধুমাত্র হযরত আলীই সম্মান লাভ করবে না বরং হযরত আলীর বংশধরও সম্মান পাবে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি প্রথম যে অনুগ্রহ করেন তা হলো তাকে রসূলে করীম (সা.)-এর জামাতা হবার সৌভাগ্য দান করেন। তার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা দ্বিতীয় যে অনুগ্রহ করেন তা হলো নবী করীম (সা.)-এর হৃদয়ে তার জন্য এতো ভালবাসা সৃষ্টি করেন যে, তিনি (সা.) বহুবার তার প্রশংসা করেছেন। যাহোক আমি একই ঘটনাসংক্রান্ত উদ্ধৃতি বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছি। সেগুলোর মূল ঘটনার দিক থেকে একই বিষয়, কিন্তু আমি যে বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করি এর কারণ হলো এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে কিছু নতুন বিষয় জানা যায় অথবা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হলে তা সামনে চলে আসে কিংবা সেই সাহাবী যেমন এখানে হযরত আলীর (রা.) এর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক সামনে এসেছে। প্রত্যেক সাহাবীর সাথে মহানবী (সা.)-এর যে সম্পর্ক ছিল তাও জানা যায়। কখনো মনে হয় একই উদ্ধৃতিই বিভিন্ন স্থানে উপস্থাপন করা হচ্ছে কিন্তু প্রত্যেক উদ্ধৃতির উপস্থাপনা ভিন্ন আঙ্গিকে হয়ে থাকে তাই উপস্থাপন করে থাকি। যাহোক হযরত আলীর (রা.) স্মৃতিচারণ চলমান রয়েছে অবশিষ্টাংশ ভবিষ্যতে উপস্থাপন করবো ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির উল্লেখ করব যাদের জানাযা পড়াব। তাদের মাঝে সর্বপ্রথম হলেন নানকানা জেলার মাঢবেলুচানের অধিবাসী তারেক মাহমুদ সাহেবের পুত্র শহীদ ডাক্তার তাহের মাহমুদ সাহেব। গত শুক্রবার ২০ নভেম্বর ২০২০ জুমুআর নামায পড়ার পর বিরোধীরা গুলি করে শহীদ করেছিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

বিস্তারিত বর্ণনা অনুসারে শহীদ মরহুম নিজ পিতা তারেক মাহমুদ সাহেব এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে ২০ নভেম্বর জুমুআর নামায পড়ার জন্য তার জ্যেঠা জনাব মুহাম্মদ নাফিস সাহেবের গৃহে একত্রিত হন। জুমুআর নামায পড়ার পর আনুমানিক বেলা আড়াইটায় নিজ বাড়িতে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাইরে বের হলে গলিতে পিস্তল নিয়ে অপেক্ষমান মেহেদ নামের ষোল বছরের এক যুবক তাদের ওপর গুলি চালায় আর এর ফলে

ডাক্তার তাহের মাহমুদ সাহেব ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে যান। إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ শহীদ মরহুমের বয়স ছিল ৩১ বছর। এ আক্রমণে শহীদ মরহুমের পিতা তারেক মাহমুদ সাহেব মাথায় গুলি লাগার দরুণ গুরুতর আহত হন এবং এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার বয়স ৫৫ বছর, তিনি সেক্রেটারী মাল এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট। অপরদিকে শহীদ মরহুমের জ্যেঠা জামা'তের প্রেসিডেন্ট ৬০ বছর বয়স্কজনাব সাঈদ আহমদ মকসুদ সাহেব এবং খোদ্দামুল আহমদীয়া যয়ীম জনাব তৈয়্যব মাহমুদ সাহেব, তার বয়স ২৬ বছর, গুলি লাগার কারণে আহত হয়েছেন আর সাময়ীকভাবে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তারা যদিও নিরাপদ রয়েছেন কিন্তু শহীদ মরহুমের পিতা গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আক্রমণকারী দুই ম্যাগযিন গুলি বর্ষণ করে তৃতীয় ম্যাগযিন লোড করার সময় ধরা পড়ে। যাহোক এখন সেখানে তারা আমাদের শত্রুতাকে এক তারা নতুন রূপ দিয়েছে অর্থাৎ, স্বল্প বয়স্ক ছেলেদের প্ররোচিত করে এবং তাদের মাধ্যমে আক্রমণ করায়, যেন পরবর্তীতে আদালতে বলতে পারে যে, এ তো নাবালক, তাই তার শাস্তি কমানো হোক অথবা এমনিতেই শাস্তি মওকুফ করে দেয়া হোক। অতএব তারা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছে আবার বলে যে, আমাদের কোন অনুযোগ নেই এবং আমরা মোটেও কোন প্রকার কঠোরতা করছি না, আহমদীদের ওপর কোন অন্যায় অত্যাচার করছি না; অথচ অপরদিকে শাহাদাতের ঘটনাও ঘটছে। আর কোন কোন সরকারী কর্মকর্তা জোরপূর্বক মামলাও করাচ্ছে। যাহোক আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করি তাদের যেন বোধোদয় ঘটে, আর যদি তা না হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাদের পাকড়াও করুন। মরহুমের বংশে আহমদীয়াতের আসে তার দাদা মোকাররম হেকীম মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেবের মাধ্যমে, যিনি তার বংশের অন্যান্য সদস্যের সাথে ১৩ বছর বয়সে দ্বিতীয় খিলাফতকালে বয়আত করেছিলেন। শহীদ মরহুম লাহোরের ইসলামীয়া কলেজ থেকে এফ.এস.সি (এইচ.এস.সি) পাশ করেন। এরপর ২০১৩ সনে রাশিয়ার মস্কো থেকে এম.বি.বি.এস ডিগ্রি অর্জন করেন। আজকাল পি.এম.সি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ফযলে উমর হাসপাতালেও কাজ করেছেন। শহীদ মরহুম বহু বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক ছিলেন। খিলাফতের প্রতি অসামান্য ভালোবাসা ছিল। জামা'তের কর্মকর্তা ও কেন্দ্রীয় অতিথিদের অসাধারণ সম্মান করতেন। যখনই তাকে জামা'তের পক্ষ থেকে কোন কাজের জন্য বলা হতো তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়ে যেতেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। বহুবার রোগীদের তিনি নিজের গাড়িতে করে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছেন। সর্বদা সেবার ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকতেন, অ-আহমদীদের সাথেও তার একই ব্যবহার ছিল। অ-আহমদী অনেক ভদ্রমানুষ এসে এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। এই পরিবারটি দীর্ঘকাল থেকে বিরোধিতাপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন। ১৯৭৪ সনেও বিরোধীরা শহীদ মরহুমের দাদার দোকান জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তার পিতা তারেক মাহমুদ সাহেবকে ২০০৬ সনে বিরোধীরা নির্মম নির্যাতনের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছিল। কিছুদিন পূর্বে আহমদীয়াতের এক শত্রু বাজার অতিক্রমের সময় শহীদ মরহুমের পিতার ওপর থুতু ফেলেছিল। এরূপ আচরণ মানুষ তাদের সাথে স্থায়ীভাবে করে আসছিল যাহোক তারা সেখানেই বসবাস করতে থাকেন।

রাশিয়ার সেইন্ট পিটার্সবার্গ-এর মুবাল্লেগ সাদাকাত আহমদ সাহেব লিখেন, শিক্ষা জীবনের একটি বড় অংশ তিনি তাতারিস্তান এর কাযান-এ অতিবাহিত করেছেন এবং সফল ডাক্তার হয়ে পাকিস্তানে ফিরে যান। তিনি বলেন, ডাক্তার তাহের মাহমুদ সাহেব শিক্ষার্জনকালে জামা'তের সাথে একান্ত নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেন। জুমুআর নামায ও চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রেও সর্বদা নিয়মিত ছিলেন। এছাড়া তার হোস্টেল মিশন হাউস থেকে বেশ দূরে হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য জামা'তী অনুষ্ঠানেও নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন এবং সাগ্রহে অংশ নিতেন। তাকে মেডিকেলে তার গ্রুপের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের একজন গণ্য করা হতো।

শিক্ষার মাধ্যম যদিও ইংরেজি ছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত পরিশ্রম এবং আগ্রহের ফলে তিনি রাশিয়ান ভাষায়ও বেশ সাবলীল হয়ে উঠেছিলেন। কাযানে যে হোস্টেলে তিনি থাকতেন, সেখানে সবাইকে জানিয়ে রেখেছিলেন যে, তিনি আহমদী। আর এ কারণে তাদের পক্ষ থেকে বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হতো, কেননা সেখানে পাকিস্তানী ছাত্ররাও ছিল, যারা জামা'তের কঠোর বিরোধিতা করত। কিন্তু তিনিও যখনই সুযোগ হতো তবলীগ করতেন। তিনি আরো লিখেন, আমি যখন পাকিস্তানে গিয়েছিলাম তখন আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, মাড বালোচাঁ-য় তাদের অনেক বেশি বিরোধিতা হচ্ছে, তাই তিনি রাবওয়া স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা রাখতেন আর তিনি রাবওয়ার ঘরও নির্মাণ করেছেন।

ফরিদ আবরা গিমুফ কাযান তাতারিস্তান এর রাশিয়ান আহমদী, তিনি বলেন, মরহুম খুব দ্রুত রাশিয়ান ভাষা শিখে নিয়েছিলেন। তিনি খুবই প্রসন্ন চিত্ত ও পুণ্য স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তার মুচকি-হাসি হতে নূর বিচ্ছুরিত হতো।

মরহুমের ছেড়ে যাওয়া পরিবারের মাঝে পিতা জনাব তারেক মাহমুদ সাহেব ছাড়াও মা মোহতরমা শামীম আখতার সাহেবা রয়েছেন। জামানীতে রয়েছেন ভাই কাসেম মাহমুদ সাহেব এবং বোন ফায়েযা মাহমুদ সাহেবা যিনি নাসীর আহমদ সাহেবের স্ত্রী। আল্লাহ্ তা'লা শহীদ মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। জান্নাতুল ফেরদৌস-এ উন্নত মর্যাদা দান করুন। আহতদের সুস্থ্যতা দান করুন এবং পূর্ণ ও দ্রুত আরোগ্য দিন। সকল আহতকে সর্বপ্রকার জটিলতা থেকে রক্ষা করুন। তার অন্যান্য প্রিয়ভাজন ও আত্মীয়স্বজনদেরও আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপায় ভূষিত করুন।

পরবর্তী জানাযা সিয়েরা লিওনের ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারী জনাব জামাল উদ্দিন মাহমুদ সাহেবের। তিনি গত ০৩ নভেম্বর তারিখে হঠাৎ হৃদ যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম গত ১৬ বছর থেকে জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। মিশনারী ইনচার্জ জনাব সাঈদুর রহমান সাহেব লিখেন, তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি একটি বিশেষ গুণ এটিও ছিল যে, পুরো বিশ্বের আহমদীদের জাতীয়তাবাদ থেকে মুক্ত করে এক পরিবারভুক্ত করার তিনি বাস্তব উদাহরণ ছিলেন। অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতেন। প্রায় ২ হাজার লোক মরহুমের জানাযার নামায ও দাফনকাফনে অংশ নিয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ২ জন সরকারী মন্ত্রী, সিয়েরা লিওনের চীফ অফ আর্মি স্টাফ, বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য ও প্যারামাউন্ট চীফসহ অসংখ্য সরকারি উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। নুসরত জাহান স্কীমের সেক্রেটারী মুবারক তাহের সাহেব লিখেন, মরহুম অনেক নিষ্ঠাবান, নিবেদিত প্রাণ এবং মনে প্রাণে জামা'তের সেবক ছিলেন। দীর্ঘকাল থেকে তিনি জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়ে আসছিলেন, সেইসাথে 'আহমদীয়া প্রিন্টিং প্রেস সিয়েরালিওন'-এর সহকারী ম্যানেজারও ছিলেন। মরহুম ঘানার অধিবাসী ছিলেন। তার পিতা মুকাররম ইব্রাহীম কোজো মাহমুদ সাহেবকে হযরত মওলানা নযীর আহমদ মুবাশ্বের সাহেব শিক্ষা বিভাগের কাজের জন্য সিয়েরালিওন প্রেরণ করেছিলেন। মুবারক তাহের সাহেব আরো লিখেন, তেরো বছর পর্যন্ত জামাল সাহেব আমার নিকট রুকুপুরে ছিলেন। তার পিতা তাকে শিক্ষার্জনের উদ্দেশ্যে তার নিকট রেখেছিলেন। তিনি শুরু থেকেই ধর্মপরায়ণ ছিলেন। বাজামা'ত নামায এবং জামা'তী অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। রুকুপুরের খোদ্দামদের সাথে তবলীগ এবং ধর্মপ্রচারের কাজ করতেন। রক্বীম প্রেস, সিয়েরা লিওন-এর ইনচার্জ উসমান তালে সাহেব বলেন, জামাল উদ্দীন মাহ্মুদ সাহেব খাকসারের পূর্বে দীর্ঘদিন থেকে সেখানে সেবা করে আসছিলেন, তিনিই সেখানকার ইনচার্জ ছিলেন। খাকসার তার সাথে বারো বছর কাটিয়েছি। এই সময়কালে তিনি কখনো এটি প্রকাশ করেন নি যে, খাকসার তার চেয়ে বয়সে ছোট এবং

অনভিজ্ঞ, বরং সর্বদা সম্মানপূর্ণ আচরণ করতেন এবং বলতেন যে, আপনি মুবাল্লেগ এবং খলীফাতুল মসীহ্ আপনাকে নিযুক্ত করেছেন। কখনো কোন বিষয়ে এমন হয় নি যে, তিনি খাকসারের আনুগত্য করেন নি। আনুগত্য এবং বিনয় তার মাঝে এত বেশি ছিল যে, তাকে কখনো কোন কাজ করতে বললে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সেই কাজ আরম্ভ করে দিতেন এবং সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করে তা সম্পন্ন করতেন। তিনি বলেন, খাকসার এই সময়কালে তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। মরহুম বিনা ব্যতিক্রমে প্রতিদিন তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। বাজামা'ত নামাযের প্রতি অনেক যত্নবান ছিলেন। এছাড়া তার নামাযের সৌন্দর্যও ছিল ঈর্ষণীয়। সর্বদা একান্ত বিনয় ও বিগলন এবং প্রশান্তচিত্তে নামায পড়তেন। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল এবং প্রতিটি জুমু'আর খুতবা খুবই সম্মানজনকভাবে বসে শুনতেন। অতঃপর তিনি আরো লিখেন, জামাল সাহেব সিয়েরা লিওন এর রীতি অনুযায়ী বহু শিশুকে নিজের বাসায় রাখেন এবং স্বীয় খরচে তাদেরকে পড়ালেখা করান। তাদের মাঝে অনেকেই এখন ভালো চাকরি করছে এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে তাকে স্মরণ করে।

মুরব্বী নাভিদ ক্বমর সাহেব লিখেন, মরহুম জামা'তী তাহরীকসমূহে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতেন। নিজ পিতামাতা ও বংশের অন্যান্য বুযূর্গদের নামে তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ খাতে অতিরিক্ত কুরবানী করতেন। যখনই তার পৈত্রিক গ্রাম রুকুপুরে আসতেন, ব্যস্ততা সত্ত্বেও সময়মতো মসজিদে উপস্থিত হতেন। সাধারণত মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে লোকজনকে জামা'তী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করতেন এবং বিশেষত আহমদীয়া খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ এবং এর সাথে সম্পৃক্ততার বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বুঝাতেন। সবার সাথে তার ভালোবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তার মৃত্যুর সংবাদে আহমদী অ-আহমদী সবার চোখ অশ্রুসিক্ত ছিল। এ কারণেই তার জানাযায় বহু সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করে এবং আশপাশের এলাকা ছাড়া দীর্ঘ সফর করেও লোকজন (জানাযায়) অংশগ্রহণের জন্য আসে।

মরহুমের দুই জন স্ত্রী ছিল। প্রথম স্ত্রীর সাথে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু সন্তান-সন্ততি তার ঘরেই ছিল, যার গর্ভে দুই কন্যা ও দুই পুত্রের জন্ম হয়। এক মেয়ের বিবাহ হয়েছে, তিনি অস্ট্রেলিয়ায় আছেন। বাকিদের মাঝে দুইজন ঘানায় পড়াশোনা করছে আর একজন সিয়েরালিওনে। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে তার কোন সন্তান নেই। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানদেরও তার পুণ্যকর্ম সমূহ ধরে রাখার তৌফিক দিন।

পরবর্তী জানাযা আমাতুস্ সালাম সাহেবার, (যিনি) সাবেক নাযেম জায়েদাদ ও রাবওয়ার আইন বিষয়ক উপদেষ্টা মরহুম মোকাররম চৌধুরী সালাহ উদ্দিন সাহেবের স্ত্রী। তিনি গত ১৯ অক্টোবর মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার স্বামী চৌধুরী সালাহ্ উদ্দিন সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত চৌধুরী আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব এবং হযরত হামনা বিবি সাহেবার পৌত্র ছিলেন। তার দাদা ও দাদী উভয়ে সাহাবী ছিলেন। তার ছেলে নঈম উদ্দিন সাহেব তার মা সম্পর্কে লিখেন যে, যেসব বিষয় আমার জীবনে অম্লা ছাপ রেখে গেছে সেগুলোর মাঝে একটি হলো, মায়ের আমাদের নামাযের প্রতি খেয়াল রাখা। এটি তার সবচেয়ে দৃঢ় কর্মপন্থা ছিল, অত্যন্ত কঠোরভাবে তিনি তা পালন করাতেন, অর্থাৎ এক্ষেত্রে তিনি খুবই অনড় ছিলেন। আমাদের ঘর কার্যত হোস্টেল এর ন্যায় ছিল। আমাদের বহু সংখ্যক আত্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে আমাদের বাসায় অবস্থান করতেন এবং তাদের অবস্থান কয়েক বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মরহুমা মা এই বিষয়ে প্রত্যেক ব্যাক্তির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন যেন সকলই সর্বাবস্থায় নিয়মিত নামায পড়ে। সকল সন্তানকে নিজে কুরআন পড়াতেন। বড়

সন্তানদের জন্য শিক্ষকও নিযুক্ত করতেন। তার দ্বিতীয় গুণ যা আমার জীবনে গভীর ছাপ রেখে গেছে তা হলো, বাড়িতে অবস্থানরত সদস্যদের সম্ভাব্য সকল আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করার জন্য তার চেষ্টারত থাকা। কোনদিন কাজের বুয়া ছুটি করলে তিনি সব শিশুর, অর্থাৎ নিজ সন্তানদেরও এবং অন্যদেরও কাপড় ধুয়ে দিতেন, কখনো লজ্জাবোধ করতেন না। আমাদের নানাবাড়ি ও দাদাবাড়ির লোকজনের প্রায় সময়ই রাবওয়ায় আসা-যাওয়া থাকতো। মরহুম বাবা অধিকাংশ সময় জামা'তের দায়িত্বের কারণে রাবওয়ায় থাকতেন না। মা সব মেহমানের আতিথেয়তা করতেন, এক্ষেত্রে কোন ত্রুটি রাখতেন না। আমি যেহেতু বড় ছেলে ছিলাম, তাই আমার চাইতেন যেন আমি যথাযথভাবে মেহমানদের আতিথেয়তা করি এবং কোন ঘাটতি যেন না থাকে। এরপর তিনি বলেন, আমাদের বড় দাদী, দাদী এবং নানী অধিকাংশ সময় দীর্ঘদিন আমাদের বাড়িতে থাকতেন আর আল্লাহ্‌র কৃপায় আমরাও ছয় ভাইবোন। এছাড়া বংশের বহু সংখ্যক ছেলে-মেয়ে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে আমাদের বাড়িতে অবস্থান করত, কিন্তু এসব পরিস্থিতি সত্ত্বেও তিনি বছরের পর বছর পরম আন্তরিকতার সাথে উক্ত তিনজন বয়োজ্যেষ্ঠ নারীর সেবা করে গেছেন। বার্ষিক জলসার সময় কম করে হলেও আশি-নব্বই জন অতিথি আসতেন। তাদের থাকা-খাওয়ার জন্য বাড়ির (বাইরে) তাঁবু খাটানো হতো। বিছানাপত্রের জোগাড় হতো গ্রাম থেকে। (আমাদের) পিতামাতা উভয়ে মিলে পুরো আয়োজন পরম ভালোবাসা আর উদারমনে ও সানন্দে করতেন। বিনা ব্যতিক্রমে সকল আত্মীয়-স্বজন তার ভালোবাসা ও অতিথিয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। তার এক ভাগ্নে লিখেছেন, আমি তার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেছি, এমন কখনো হয় নি যে, সকালের বাসি রুটি তিনি আমাদের সন্ধ্যেবেলা দিয়েছেন অথবা রাতের বানানো রুটি সকালে খাইয়েছেন, বরং নাস্তায় সর্বদা গরম পরোটা এবং তাজা দই দিতেন। অন্যের সন্তানদের অর্থাৎ, নিজের আত্মীয়-স্বজনের সন্তান যারা (তার বাড়িতে থেকে) পড়াশোনা করছিল তাদের প্রতি এতটাই যত্নবান ছিলেন অথচ নিজের সন্তানাদিও যথেষ্ট ছিল। জামাতের খলীফাদের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক আদর্শস্থানীয় ছিল। এরপর তিনি আরো বলেন, এসব সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি ভালোবাসা ও আবেগের প্রেরণা আমাদের শিরা-উপশিরায় ধাবমান । তার পুত্রবধূ নাবীলা নঈম সাহেবা বলেন, মরহুমা অনেক গুণের আধার ছিলেন। নামাযের প্রতি যত্নবান ছিলেন, পবিত্র কুরআন পাঠকারিনী, তাহাজ্জুদ গুযার, অত্যন্ত ধৈর্যশীলা এবং কৃতজ্ঞ নারী ছিলেন। কঠিন পরিস্থিতিতেও কখনো কোন অনুযোগ-অভিযোগ করতেন না। খোদা তা'লার ইচ্ছায় সর্বদা সন্তুষ্ট থাকতেন। দরিদ্রের লালকারিণী ছিলেন। কারো দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। সদা তাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। মরহুমা খিলাফতের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে সদা অগ্রগামিনী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানসন্ততি এবং বংশধরদেরও এসব গুণাবলী ধারণ করার তৌফিক দিন। মরহুমার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো, ডাক্তার লতীফ কুরাইশী সাহেবের শ্রদ্ধেয়া মনসূর বুশরা সাহেবার, যিনি গত ০৬ নভেম্বর তারিখে ৯৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের সন্তান ছিলেন। হযরত মুনশী ফাইয়ায আলী কপুরথলভী সাহেব (রা.)-এর দৌহিত্রী এবং হযরত শেখ আব্দুর রশীদ সাহেব (রা.)-এর পৌত্রী ছিলেন। তারা উভয়ে [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর] সাহাবী ছিলেন। শৈশবে হযরত আম্মাজান (রা.)-এর সাথে মরহুমার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। মরহুমা স্মৃতি শক্তির দুর্বলতা সত্ত্বেও অন্তিম সময় পর্যন্ত কখনো নামায পড়তে ভুলেন নি। এম.টি.এ.-তে নিয়মিত জুমুআর খুতবা শুনতেন। একজন পুণ্যবতী, বিশ্বস্ত ও পুণ্যবতী নারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুমা ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন। যেমনটি আমি বলেছি, মরহুমা ডাক্তার লতীফ কুরাইশী

সাহেবের মাতা ছিলেন। সম্প্রতি কুরাইশী সাহেব এবং তার স্ত্রী শওকত গওহর সাহেবাও ইন্তেকাল করেন। তারা অর্থাৎ, ডাক্তার সাহেব এবং তার স্ত্রী যতদিন জীবিত ছিলেন, মরহুমার অনেক সেবাযত্ন করেছেন। যাহোক, মায়ের জীবদ্দশায়ই তারা উভয়ে ইন্তেকাল করেছিলেন।

মরহুমার পৌত্রী ইসমত মির্যা লিখেন যে, আমার দাদী সত্যিকার মু'মিনা এবং আহমদীয়াত ও খিলাফতের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এক নারী ছিলেন। আমি তার চেয়ে বেশি ইবাদতকারিণী এবং কুরআনের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা পোষণকারী কাউকে দেখিনি। নীরব প্রকৃতি ও সাদাসিধে স্বভাবের অধিকারিণী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। জুমুআর নামাযের পর আমি উক্ত সব প্রয়াতের গায়েবানা জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)